দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

উপন্যাসের বঙ্কিম

সাহিত্যের নবীনতর শাখা উপন্যাস। পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত গীতিকবিতানির্ভর। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর কোনো দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মেলে না। ঔপনিবেশিক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট মননের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম হয়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শেষে উনিশ শতকের শুরুতে যে গদ্যের জন্ম হয়, সেটাও ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরেই। মধ্যযুগের সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মানুষের মুক্তিলাভ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধনের ফলে উপন্যাস সৃষ্টির তাগিদ জন্মে। সে কারণেই পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জটিল চিন্তা, দর্শন ও অনুভূতি থেকেই উপন্যাসের উদ্ভব। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা হয় উপনিবেশশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে। বাংলা উপন্যাসের মূল গ্রথিত পাশ্চাত্যে, ফলে বাংলা উপন্যাস ছিল অনেকটাই দিকভ্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক। ঔপনিবেশিক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গদ্য ও উপন্যাসের জন্ম, তার বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক। জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা হওয়ার ফলে পাশ্চাত্যের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রতিষ্ঠা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ১৮৫২ সালে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। 'কমলাকান্ত' ছদ্মনামে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তিনি তুলে ধরেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে 'সাহিত্য সম্রাট' হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিত তথা মানস' (১৮৫৬)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী*র (১৮৬৫) রচয়িতা তিনি। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা

১৫টি। *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রাধারাণী* (১৮৮৬), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *লোকরহস্য* (১৮৭৪), *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫), *সাম্য* (১৮৭৯), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৯২) তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রথম তিনটি (দুর্গেশনন্দিনী, *কপালকুণ্ডলা*, *মৃণালিনী*) ও শেষ (সীতরাম) উপন্যাস বাদ দিয়ে বাকি দশটি উপন্যাস *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত হয়। *সীতারাম* প্রকাশিত হয় *প্রচার*-এ। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের যাত্রা শুরু। *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা*, *মৃণালিনী* বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে লিখিত। বঙ্গদর্শনের যুগের আরম্ভে *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের বঙ্কিমের নিজস্ব রীতি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সংবাদপত্রের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলো প্রকাশিত হয় বাঙালি সমাজের ভেতর মতবিনিময়ের প্রয়োজনে। *দিকদর্শন*, *সমাচার দর্পণ*, *তত্ত্ববোধিনী*, *বঙ্গদর্শন*, *ভারতী*, ইত্যাদি পত্রিকায় তখন নাগরিক সমষ্টিমতো সংগঠনের দায়ে আরেক নতুন বাকরীতির চর্চা শুরু হয়। এই ভাষা ও সাহিত্যের ধারায় বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র উপনিবেশের ইতিহাসেরই অংশ। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের সমস্ত গ্লানি, অসম্মান ও ক্লিন্নতার ভেতর থেকে তৎকালীন সংবাদ সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যচর্চা চলতে থাকে। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম আন্দোলন এই স্বীকৃতির প্রথম চিহ্ন। তাদের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলে। কলোনির মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের নিজস্ব আত্মদ্বন্দ্বে, শিক্ষায়, চারিত্রিক অসঙ্গতিতে খণ্ডিত জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকায় তার সাহিত্যও গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের আদলে। তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের এই মধ্যবিত্তের হাতেই শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তন ঘটে। বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের অগ্রগতি শুরু হলেও তারা সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। বাংলা সাহিত্য উনিশ শতক থেকেই মূলত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতেই গড়ে ওঠে। ইংরেজ রাজশক্তি মুসলমান সামন্ত্রতন্ত্রকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের দিকে যে দৃষ্টি দেয়, তাতে মুসলমান সামন্ত্রতন্ত্রের কেবল আর্থিক ধ্বংসই ঘটেনি, মানবসম্পদেরও বিপর্যয় ঘটে।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্যের প্রচলনও শুরু হয় গভর্নর জেনারেলের প্রচারিত নির্দেশে স্বদেশ থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এদেশের কর্মক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্য আকারগতভাবে অস্থির। উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনবোধ, যুগসচেতনতা ও আদর্শের অনুসন্ধান দেখি তা '*ফুলমণি ও করুণার বিবরণ*'-এ (১৮৫২) পাওয়া না গেলেও *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৭) উপন্যাসে কিছুটা আভাস মেলে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্যের একজন গর্বিত ও অধিকারবোধ সচেতন প্রজা হিসেবে বাঙালি তখন তার অন্য এক আত্মজীবনীর সন্ধান করে। যাতে নিজেকে আবিষ্কার করা যায় বিস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিতে। *আলালের ঘরের দুলাল* কিংবা *হুতোম পেঁচার নকশা* (১৮৬২) সেই পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিতের কথা বিন্দুমাত্র বলে না। প্রস্তুতিমূলক এই সাহিত্যকর্মটিকে পুরোপুরি উপন্যাস না বলা গেলেও নকশাজাতীয় এই রচনা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবুও এই বহুস্বরের বিপরীতে বাঙালি অপেক্ষা করে মহৎ কোনো একস্বরের। যে স্বর লেখকের এবং কেবল লেখকেরই।

উনিশ শতকের সূচনা থেকে কলকাতা শহর একটি পরিবর্তিত চেহারা পেতে শুরু করে, কিন্তু তখনও গ্রামীণ রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মননের ফলে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, *আলালের ঘরের দুলাল*-এ কলকাতার ইংরেজি স্কুল, পথঘাট-বাজার, আদালতের চিত্র যেমন আছে, তেমনি কলকাতার অদূরবর্তী বৈদ্যবাটি-বালির পল্লিজীবনের অনিবার্য পরিবর্তনের ছবিটিও তুলে ধরা হয়। বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ এই নকশা জাতীয় রচনাটি।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্যে উপন্যাসের ধারা পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সে যুগে ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো অতীতভিত্তিক রোমান্টিক কল্পনার সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্যের উপন্যাসে স্বদেশপ্রীতি, রোমান্স ও ইতিহাসপ্রীতির প্রভাব আমাদের উপন্যাসেরও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বিশেষত এই প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ততদিনে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কায়েম হয়ে গেছে। কীভাবে, কোনদিক দিয়ে সমাজ ও

শিক্ষার ব্যবস্থা পরিচালনা করে নিজেদের শাসন আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী করা যায় তা নিয়ে তখন গবেষণা চলছে। তৎকালীন কলকাতা নগর ও হিন্দু কলেজ থেকে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি সাহিত্যের এই ভাবধারা গ্রহণ করে।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যে এই প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্য এর ব্যতিক্রম নয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার সমাজ সংস্কারমূলক নানা ঘটনা ঘটে যেমন বিধবা বিবাহ প্রচলন, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, নারী শিক্ষার প্রচলন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব। এসব নানাবিধ সামাজিক অনুষঙ্গের সঙ্গে রাজনৈতিক নানা ঘটনাও সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একইসঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সাহিত্য জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটে আমাদের সাহিত্যে।

দুর্গেশনন্দিনী, *কপালকুণ্ডলা*, *আনন্দমঠ*, *দেবী চৌধুরাণী* ইত্যাদি উপন্যাস এ যুগেরই সৃষ্টি। *দুর্গেশনন্দিনী* লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে স্কটের *ঞযব অহঃরয়ঁধহু* উপন্যাসের প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রেমের পরিচয় মেলে। যে সমাজে নারীরা একেবারেই পশ্চাৎপদ সেখানে *কপালকুণ্ডলা*, *দেবী চৌধুরাণী*র মতো চরিত্র সৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু তা বাংলাসাহিত্যে এক হঠাৎ পরিবর্তন। ফলে বঙ্কিমের মধ্যেও কাজ করে এক ধরনের স্ববিরোধিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একদিকে রোমান্স ও অন্যদিকে ইতিহাসাশ্রয়ী।

একারণে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসে পাশ্চাত্যের আদলে গড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের নবরূপায়ণ দেখি। বঙ্কিম তাঁর আখ্যানকে নিয়ে যান ৯৯৭ বঙ্গাব্দে (*দুর্গেশনন্দিনী*), আকবরের শাসনামলে (*কপালকুণ্ডলা*), লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় (*মৃণালিনী*)। ফলে তাঁর উপন্যাস নব্যশিক্ষিত পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের এই সূচনা হলো জনসাধারণের জীবন থেকে বহুদূর গিয়ে। সাধারণ বাঙালি জীবনের অনুষঙ্গ সেখানে উপস্থাপিত হয়নি। ইংরেজ ভদ্রসমাজের বা অভিজাত শ্রেণির অনুকরণ করতে গিয়ে এবং এদেশীয় অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা তাই অনেকটাই বিসদৃশ হয়ে পড়ে।

বঙ্কিমের আগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের কোনো উদাহরণ না থাকায় তাঁর সামনে ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র উদাহরণ। ফলে এরকমভাবে উপন্যাস লিখলেই উপন্যাস হয়ে উঠবে এ বিষয়ে তিনি অনেকটাই স্থিতসিদ্ধান্তে পৌঁছান। তিনি বাঙালি জীবনের অন্তর্নিহিত

নাটকীয় গুণকে ব্যবহার করেন। যেখানে জনসাধারণের অনুপ্রবেশ নেই বললেই চলে। তবে উপন্যাসের সূচনাপর্বে বঙ্কিমের ভিন্ন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য ভূমিকা রাখে। ১৮৬৫-র বছর দশেক আগে বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় আর তখন বাংলা উপন্যাসের নায়িকা ঘোষণা করে, 'এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। আরেক নারীকণ্ঠেই উচ্চারিত হয়, 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'। ফলে তা নিঃসন্দেহে বাংলা গদ্য তথা উপন্যাসের ধারায় এক ভিন্ন কণ্ঠস্বর।

ড. মাহবুবুল হক
অধ্যপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম খণ্ড

দুর্গেশনন্দিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ : দেবমন্দির

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কী জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোনোমতে চলিতে লাগিলেন।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়দ্দূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোনো কঠিন দ্রব্যসংঘাতে ঘোটকের পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোনো পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণমাত্র জানিতে পারিলেন যে, প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলীর সংস্রবে ঘোটকের চরণ স্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়-স্থান আছে জানিয়া, অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজে অন্ধকারে সাবধানে সোপানমার্গে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তড়িতালোকে জানিতে পারিলেন যে, সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ; হস্তমার্জনে জানিলেন, দ্বার বহির্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই। এই জনহীন প্রান্তরস্থিত মন্দিরে এমন সময়ে কে ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল, এই